চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি

বাংলা 'চেতনাপ্রবাহরীতি' শব্দটি ইংরেজি *'Stream of consciousness'* শব্দবন্ধ থেকে আহৃত যার অর্থ-জাগ্রত বা সজাগ মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রবাহ বা সচেতনতা । প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ তাঁর *'Principles of Psychology' (1890)* গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন । গ্রন্থটিতে তিনি এই শব্দগুচ্ছকে ব্যবহার করেছিলেন একটি বিশেষ অর্থে, সে অর্থটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন--

"Consciousness, then, does not appear to itself chopped up in bits. Such words as 'chain or train' do not describe fitly as it presents itself in its first instance. It is nothing joined, it flows. A 'river' or a 'stream' is the metaphors by which it is most naturally describe. In taking of it, let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life."[১]

অর্থাৎ চেতন, অবচেতন বা প্রাক্‌চেতন সবটুকু মিলিয়েই ব্যক্তিচেতনার যে নিরবিচ্ছিন্ন চিন্তার ধারা, মানব মনের প্রচ্ছন্ন অনুভূতির যে সক্রিয় ধারাবাহিকতা, অবদমিত আবেগ, ইচ্ছা কিংবা উপলব্ধির এক অবিচ্ছিন্ন স্রোতপ্রবাহ -তাই *'Stream of consciousness'* বা চেতনাপ্রবাহরীতি । উইলিয়াম জেমস্ তাঁর গ্রন্থের *'The Stream of Thought'* পরিচ্ছেদে এই চেতনাপ্রবাহরীতি এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন । তাঁর মতে মানব মনের নিগূঢ় অন্তর্স্বভাব, চেতনার বিশ্লিষ্ট এবং অবিচ্ছিন্ন গতিধারা মোট পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত । বৈশিষ্ট্যগুলো হল--

১৭. *"Every thought tends to be part of a personal consciousness."*

১৮. *"We never have the same thought or idea or feeling twice, that 'no state once gone can ever recur and be identical."*

১৯. *"There are no breaks and cracks in the stream of consciousness, it is sensibly continuous."*

২০. *"The fact that thought deals with object other than itself."*

২১. *"The stream of consciousness, it is always choosing among them, welcoming, rejecting, accentuating, selecting."*[২]

বাংলায় বৈশিষ্ট্যগুলোর অর্থ করলে তা অনেকটা এরূপ দাঁড়ায় -

১. ''চেতনা সকল সময়ই কোন ব্যক্তি বিশেষের মনের অন্তর্ভুক্ত । মন ছাড়া চেতনার কোন অস্তিত্ব নেই''

২. ''যে অনুভূতি কিংবা উপলব্ধি একবার আমাদের চেতনায় ঢেউ খেলে যায় তা আর দ্বিতীয়বার একই সংবেদনের সঙ্গে ফিরে আসে না । হয়তো একই বস্তুর দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি, কিন্তু তবুও আমাদের প্রথম মুহূর্তের অনুভব পরমুহূর্তের অনুভবের থেকে অভিন্ন হয়।''

৩. ''চেতনার নিরবিচ্ছিন্ন ধারা স্বতঃস্ফুর্ত- অনেকটা নদীর স্রোতের মতোই অবিচ্ছিন্ন এই ধারা।''

৪. ''বস্তু সম্পর্কে সচেতনতা ।''

৫. ''চেতনা পরিবেশের বস্তুবিশেষের ওপর নিজেকে নিবিষ্ট করে অপরাপর সকল বস্তুকে বর্জন করে । মনের আগ্রহই নির্ধারণ করে দেয় চেতনার এই নিবিষ্টতা ।''

উইলিয়াম জেমস্‌ের এই তত্ত্ব এবং তথ্যবাহী আলোচনা এবং বিশ্লেষণ থেকে যে চেতনাপ্রবাহের সূত্রপাত, পরবর্তীকালে তাই আধুনিক সাহিত্যবোধের সম্পূর্ণ নতুন শিল্পাদর্শ, শিল্পরীতি এবং ভাষাপদ্ধতির এক ভিন্নতর রচনাকৌশল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । তবে বিশেষ অর্থে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হবার কিছু পূর্বেই ইংরেজি সাহিত্যিক হেনরি জেমস্‌ের কোনো কোনো উপন্যাসে চরিত্রের মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্য দীর্ঘ অন্তদর্শনময় বর্ণনা দেখা যাচ্ছিল । উপন্যাস ছাড়াও তিনি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ *'Partial Portraits'* -এ উপন্যাসের নতুন কলাকৌশল এবং রচনারীতি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক বক্তব্য উত্থাপন করেন । যেখানে তিনি বলেছিলেন-আত্মসচেতনতা একজন লেখকের নতুন উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার আত্মপ্রত্যয়ী জগৎ । এই আত্মসচেতনতা থেকেই সৃষ্ট *monologue interieur* বা *Internal monologue* যার পরস্পরিত শব্দ *'Stream of consciousness'* । প্রায় একই সময়েই ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে *Edouard Dujardin* নামে এক ফরাসি লেখকের *Les Lauries sont coupes' (The Laurels Have Been Cut)* নামক ছোট একটি উপন্যাসে নায়কের মনের প্রতিফলিত সবরকম ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনার এক দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে । তবে তাঁর

এই উপন্যাস ব্যক্তির আত্মগত ভাবনার তেমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে নি । *Internal monologue* সম্পর্কিত - *Edouard Dujardin* এর ভাবনার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় বহু পরে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত এক ভাষণে--

"The interior monologue is the discourse without auditor, unspoken, by which a person express his inmost thought, the thought nearest the unconscious, anterior to any logical organization, by means of sentences with a minimum of syntax. It is done so as to give the impression that it is poured out, an is a slice of the interior life without explanation or commentry."[৩]

তাঁর এই বক্তব্য থেকে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় সেগুলো হল--

ক. অনুচ্চারিত আত্মকথন ।

খ. তির্যক বাক্যবিন্যাস ।

গ. ভাষার অনুচ্চ প্রকাশ ।

ঘ. স্বগতোক্তি ।

অনুচ্চারিত আত্মকথন, তির্যক বাক্যবিন্যাস, ভাষার অনুচ্চ প্রকাশ কিংবা স্বগতোক্তি সবই ব্যক্তির অবচেতন অনুধাবনের নানাবিধ প্রক্রিয়ার ভাষাগত প্রকাশ । এক্ষেত্রে চিন্তার পুনরাবৃত্তি সময়ের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে । তাই চেতনাপ্রবাহ রীতিতে 'সময়' আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এখানে সময়ের রূপ একেবারেই খন্ডিত, আনুপূর্বিক বলতে কিছু নেই । অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এখানে চরিত্রের চেতনায় একাকার হয়ে যায় । শুধুমাত্র প্রধান চিন্তাটি থাকে ঘটমান বর্তমানে । এই ঘটমান বর্তমানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায় । পরবর্তীতে এই ভাবনার সমান্তরালে দেখা গেল আর এক দর্শন-দার্শনিক বের্গসঁর 'এলেন ভাইটাল'। বের্গসও সময়কে দেখেছিলেন এক ধারাবাহিক প্রবাহরূপে যা চেতনাপ্রবাহরীতির মূল বৈশিষ্ট্য । এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার ঠিক পরবর্তী সময়পর্বে একদিকে মনস্তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে আলোড়নসৃষ্টিকারী ভাব-ভাবনা ও অন্যদিকে 'আধুনিক' শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনসমূহের জায়মান বাতাবরণে এক নতুন ধরনের রীতির উদ্ভব হয় যা 'চেতনাপ্রবাহরীতি' নামে পরিচিত হয় । ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ লেখিকা মে সিনক্লেয়ার, ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাস *'Pointed Roofs'* -এর সমালোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম এই 'চেতনাপ্রবাহ' পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছিলেন । ডিকেন্স ও হার্ডি থেকে উদ্‌বর্তিত

প্রচলিত কাহিনি-নির্ভর বাস্তবতন্ত্রী উপন্যাসের ধারা থেকে সরে আসার এক পরীক্ষাধর্মী প্রবণতা শুরু হয়েছিল এই চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে এক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের কথা যা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই চিত্রকলা অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত ভ্যান গগ, গগ্যাঁ, মাতিস, পিকাসো, সেজান প্রমুখের চিত্রকে উদ্দেশ্য করে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ মন্তব্য করেছিলেন--

"In or about December 1910 human character changed"

মানব চরিত্র, যা অতিব জটিল ও দুর্জ্ঞেয়, তা কি কোনো বিশেষ মাস বা বছরে পাল্টে যেতে পারে ? আসলে উল্‌ফ্‌ বলতে চেয়েছিলেন যে ঐ সময় থেকে মানবচরিত্র তথা মনকে দেখা, বোঝা এবং তাকে শিল্প-সাহিত্যে ব্যক্ত করার পদ্ধতি বদলে যেতে থাকে । একটি জমজমাট কাহিনির চৌম্বকশক্তিতে পাঠককে তৃপ্ত করা বা চরিত্রের বহিরঙ্গের খুঁটিনাটি, আচার-আচরণ ,তার সামাজিক জীবনযাপন ও অভিজ্ঞতার দিকটিকে বড়ো করে না দেখে, তার অন্তর-ধর্মের রহস্য ও তার ভিন্নমুখী জটিল মানস প্রক্রিয়ার উন্মোচন এবং কাহিনির চিরাচরিত দাসত্ব থেকে উপন্যাসকে মুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয় । তথাকথিত বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক যথা, বেনেট, ওয়েলস্‌, গলস্‌ওয়ার্দি প্রমুখের রচনায় বিষয় ও রীতির বিরূদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় এই নতুন মনস্তাত্ত্বিক, ব্যঞ্জনাধর্মী, গভীরসঞ্চারী রচনাশৈলী ও অপূর্ব কাব্যকল্পনামন্ডিত ভাষারীতি 'চেতনাপ্রবাহরীতি' নামে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে । মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ উপন্যাসে এর আগে ছিল না তা নয়, তবে আধুনিক মনোবিশ্লেষণ ও সমীক্ষণ বিষয়ক নানা তত্ত্ব, বিশেষত ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা ও পর্যবেক্ষণ, এই সময়ে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিল। অপরদিকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় মার্শেল প্রুস্ত-এর *'A la recherché du temps du perdu'* উপন্যাসের প্রথম দুটি খন্ড । উপন্যাস দুটিতে অন্তর্ভাষণ বা *Internal monologue* না থাকলেও চেতনার স্মৃতিস্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল প্রুস্তের উপন্যাসে । ১৯১৫-তে প্রকাশিত হয় ডরোথি রিচার্ডসনের সুবৃহৎ উপন্যাস *'Pilgrimage'* -এর প্রথম খন্ড *'Pointed Roofs'*. এ উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজি ভাষার উপন্যাস সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সূচনা হয় । পরের বছরই জেমস্‌ জয়েস লেখেন *'A Portrait of the Artist as a Young man'* । তাঁর *Ulysses (1922)'*, ভার্জিনিয়া উলফের *'Mrs Dalloway (1925)'*

এবং উইলিয়াম ফকনারের *'Tre Sound and the Fury' (1928)*। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এগুলো চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের ধারায় প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাস ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের মত বাংলা কথাসাহিত্যেও প্রথম সার্থক কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', এবং 'রজনী' উপন্যাসে এই চেতনাস্তরকে উন্মোচনের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল । যদিও শৈলীর নিরীখে এগুলোকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস বলা যাবে না । সেদিক থেকে অনেকখানি এগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর- 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসে । 'আঁতের কথা' বের করে আনার ক্ষেত্রে 'চোখের বালি', ভাষা ও চরিত্র রূপায়ণের অভিনবত্বে 'চতুরঙ্গ' এবং বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের ত্রিকোণ সম্পর্কের অন্তচারণায় 'ঘরে-বাইরে' আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের স্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ ।

রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে এই চেতনাপ্রবাহরীতির প্রথম সঠিক প্রয়োগ দেখা যায় গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস 'একদা' (লিখিত-১৯৩৩ খ্রিঃ, প্রকাশিত-১৯৩৯ খ্রিঃ), 'অন্যদিন' (লিখিত-১৯৪৯ খ্রিঃ, প্রকাশিত-১৯৫০ খ্রিঃ), 'আর একদিন' (লিখিত-১৯৪৯ খ্রিঃ, প্রকাশিত-১৯৫১ খ্রিঃ) বা একত্রে 'ত্রিদিবা' এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭), এবং 'মোহনা' (১৯৪৩)-য় । চৈতন্যস্রোতের আধুনিক রীতিকে আশ্রয় করে গোপাল হালদার তাঁর 'ত্রিদিবা' উপন্যাসে বৈপ্লবিক-জীবন জিজ্ঞাসার যে সংশয়ক্ষুব্ধ মানবিক শ্রী ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলা কথাসাহিত্যে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ । তবে চেতনাপ্রবাহ রীতির শুদ্ধতার বিচারে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা'-গোপাল হালদারের 'একদা'-র চেয়ে অধিক মনোজ্ঞ তাতে সন্দেহ নেই । তার কারণও সম্ভবত নিহিত আছে দুই লেখকের শিল্পী চরিত্রের পার্থক্যে । গোপাল হালদার প্রথমত ছিলেন একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ -তারপর ছিলেন সমকালীন সাহিত্য-সচেতন এক লেখক । অপরদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথমত ছিলেন সমকালের ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার পরিমন্ডল সম্পর্কে ক্ষুরধার সচেতন এক বুদ্ধিজীবী এবং দ্বিতীয়ত একজন মননশীল ভাষা-শিল্পী । নিজেকে তিনি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির একজন উত্তরাধিকারি বলেই জানতেন । আর সে জানা একেবারে যথার্থ । রাজনীতি- সচেতনতার ব্যাপারটা তাঁর মনের একেবারে কেন্দ্রে ছিল বলে মনে হয় না, অনেক বুদ্ধিজীবীই যেমন অনেকটা দলীয় আনুগত্য নিরপেক্ষভাবে রাজনীতি সচেতন-ধূর্জটিপ্রসাদের মনের ভাবও অনেকটা সেরকমই ছিল বলে মনে হয় । অপরপক্ষে

গোপাল হালদার স্বেচ্ছায় একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করবার দায় নিজেই নিজের উপর চাপিয়েছিলেন । একারণে তাঁকে কিছুটা বিবৃতিকারের ভূমিকাতেও থাকতে হয়েছে । ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সেরকম কোন দায় ছিল না । তাই 'অন্তঃশীলা'-তে চেতনাপ্রবাহ রীতির অনায়াস সাফল্য অর্জনে কোন অসুবিধা হয়নি তাঁর । ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার ছাড়া বুদ্ধদেব বসুর রচনায় চেতনাপ্রবাহরীতি প্রকাশের ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় । তাঁর কবিত্বশক্তি ও তাঁর গদ্যরচনার দক্ষতা একই সঙ্গে তাঁর বহু উপন্যাসের স্মৃতির দরজা খুলে নায়কের ভাবনা-চিন্তা ও অনুভূতির এক বিচিত্র মায়াজাল তৈরি করেছে । তাঁর 'লাল মেঘ', 'নীলাঞ্জনের খাতা', 'তিথিডোর'- ইত্যাদি বহু উপন্যাসেই এই চেতনাপ্রবাহরীতির প্রকাশ রয়েছে । এছাড়া সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫), সমরেশ বসুর 'বিবর', বিমল করের 'অপরাহ্ন', সন্তোষ কুমার ঘোষের 'শ্রীচরণেষু মাকে' ইত্যাদি চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ ।

তবে এদের মধ্যে বাংলা ভাষায় চেতনাপ্রবাহ রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫) ।১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি পরিবারের চারটি চরিত্রের চেতনার স্তরে চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার যে প্রবাহ ধাবিত হচ্ছিল, তাকে অর্থাৎ বাবা, মা, বিলু ও নীলু, এই চারটি চরিত্রের অন্তর-সত্য উদ্ভাসিত করেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর কারান্তকালে -কারান্তরালের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস 'জাগরী'-তে । চেতনার প্রাক্-বাচনিক স্তরে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও স্মৃতির অনুষঙ্গে যে চিন্তার প্রবাহ বিলুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে তার নিজের মনে এবং তার বাবা, মা ও ছোট ভাই নীলুর মনের গভীরে ভাসছিল তাকে নিপুণ শিল্পদক্ষতায় সাজিয়ে লেখক নির্মাণ করেছেন একটি কাহিনিবৃত্ত ।

নির্জন 'ফাঁসি সেলে' মৃত্যুর অপেক্ষায় বিলু, 'আপার ডিভিসনে' তার গান্ধীবাদী পিতা, 'আওরৎকিতা'-য় তার মা, 'জেল গেটে' ছোট ভাই নীলু-এই চারটি চরিত্রই একটি ভয়ঙ্কর পরিণতিকে সামনে রেখে চিন্তার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চেতনার গভীর থেকে গভীরতর প্রবাহে ক্রমশ ডুবে গেছে । স্মৃতির আঁকাবাঁকা পথ ধরে নানা ঘটনা, কথা, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নানা অনুভূতি এলোমেলোভাবে ভিড় করেছে যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকেই অনুভব করতে চেয়েছে আপন অন্তর-সত্যকে যা কেবল অনুভবের যোগ্য কিন্তু যাকে বাচনিক রূপে প্রকাশ করা দুষ্কর। উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে কীভাবে লেখক বিলুর অন্তর্জগতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন--

''আশ্চর্য আমার মনের গতি ! কালো রঙ-এর কথা শুনিয়াই ভাবি ব্ল্যাক-জাপান না আলকাতরা ? ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করি, আলকাতরা না কি ? দড়িটা কিসের ? শনের না কি? নিজের মনের উপর নিজেরই বিদ্রুপ করিতে ইচ্ছা হয় । এখনও কি দড়িটা কিসের তৈরি সেই কথাটি জানাই আমার বেশি দরকার । চিরকাল আমার মনের এই অদ্ভুত গতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি । প্রয়োজনীয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়েই আমার আকর্ষণ বেশি। .....। এক এক সময় নিজের উপর সন্দেহ হয়, হয়তো বা দেশের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা আমার নামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বেশি সজাগ । সত্যই কি তাই ? একদিনের জন্যও জীবনের স্থূল উপভোগের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিই নাই । দেশের জন্য যাহা ভালো মনে করিয়াছি তাহা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই ।নিজের ব্যক্তিগত সুখ বা ভবিষ্যতের কথা ভাবি নাই । তাহার পরিবর্তে যদি চাই যে দেশের লোক আমার সম্বন্ধে দুই একটি প্রশংসাসূচক কথা বলুক, তাহা হইলে কি আমার আকাঙ্ক্ষা অনায্য ?''[৪]

এইভাবে বিলুর চেতনায় একটা একটা অভিজ্ঞতা, ঘটনার স্মৃতি ভাসতে ভাসতে আসে, আবার মিলিয়ে যায় । তৈরি হয় চলচ্চিত্রের 'মন্তাজ' । চেতনাপ্রবাহের নিরবচ্ছিন্ন গতি পরিস্ফুট করতে সাধারণভাবে 'অন্তর্ভাষণ' ব্যবহার করাই রীতি । 'জাগরী'-তে ব্যবহৃত হয়েছে 'প্রত্যক্ষ অন্তর্ভাষণ' তথা *Direct interior monologue* বাবা, মা, বিলু, নীলু-চারটি চরিত্রই উত্তম পুরুষে নিজ নিজ চেতনালোক উন্মোচিত করেছে । এর ফাঁকে ফাঁকে প্রহরী, ওয়ার্ডার, জেলের সঙ্গি-সাথি যাদের কেউ কেউ সর্বদর্শী লেখক বা পর্যবেক্ষকের মতো তাদের টুকরো টুকরো মন্তব্য জুড়ে দিয়েছে । চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের চরিত্র বা চরিত্রগুলোর মানস-উপাদান অনেক সময়ই প্রকাশ করা হয় স্বগতোক্তির মাধ্যমে । সতীনাথও তাঁর চরিত্রগুলোর আন্তর্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন স্বগতোক্তি- কৌশলে । চেতনাপ্রবাহরীতিতে নিরবচ্ছিন্ন গতি বজায় রাখতে মুক্ত অনুষঙ্গকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । জাগরীর-র চারটি মুখ্য চরিত্র স্মৃতির মুক্ত অনুষঙ্গের মাধ্যমে নিজ নিজ জীবনের বলয়টি রচনা করেছেন ।

এভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদারের হাতে বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির যে সার্থক সূত্রপাত ঘটেছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই ধারারই এক যোগ্য উত্তরসূরি । কেননা তাঁর তিনটি উপন্যাসই-'লালসালু' (১৯৬৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) ব্যক্তিলোকের নিজস্ব উপলব্ধির সামগ্রিক তাৎপর্য প্রকাশে সচেতন এবং সার্থক । বিশেষভাবে তাঁর শেষ দুটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), এবং

‘কাঁদো নদী কাঁদো’(১৯৬৮) -তে চরিত্রের চেতন এবং অবচেতনের অতল গভীরে আলোক নিক্ষেপণে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক । শুধু উপন্যাসই নয় তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পও আংশিকভাবে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত । যা সচরাচর কোন লেখকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না । এছাড়াও রয়েছে নাটক ‘তরঙ্গভঙ্গ’ (১৯৬২)-যেখানে ঘটেছে স্বপ্ন কল্পনার স্বভাবজাত আসা-যাওয়া এবং চরিত্রাবলীর মনোগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুনিপুণ উদ্‌ঘাটন ।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে ‘চাঁদের অমাবস্যা’(১৯৬৪) থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতন এবং অবচেতনগামী আধুনিক সাহিত্য-তরঙ্গের নবরীতির এই আঙ্গিক নিরীক্ষার শুরু । বস্তুত ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪) -কেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনাপ্রবাহরীতি নিরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে বিবেচিত করা যায় । কারণ এ উপন্যাসে তিনি এক জটিল একক চরিত্র নির্মাণে ব্যস্ত থেকেছেন এবং চেষ্টা করেছেন সেই চরিত্রের বিস্তৃত, বিপুল, মানসভুবনের নিবিড় অবগাহনে । উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আরেফ আলীর মানসতত্ত্ব, তার অন্তর্গত চেতনার অনুচ্চারিত বিস্ময়, আলোড়ন এবং আবর্তনই এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় । আরেফ আলী দূর চাঁদপাড়া গাঁয়ের এক সামান্য হতদরিদ্র স্কুলমাস্টার । এই অভাবী, মুখচোরা এবং দুর্বলচিত্ত সম্পন্ন যুবকই একদিন নিজের অজান্তে জড়িয়ে পড়ে এক হত্যাকান্ডের সঙ্গে । সে হত্যাকারী আবার অন্য কেউ নয়, তারই আশ্রয়দাতা বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি আলফাজউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাদের চৌধুরী, যে আবার সমাজে দরবেশ হিসেবে পরিচিত । আরেফ আলী নিজের বৈচিত্র্যহীন কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিষ্পাপ জগতের সঙ্গে এই রক্তাক্ত জগতকে মানিয়ে নিতে পারে না। ফলে হত্যাকান্ডের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরেই কাদেরকে ঘটনাস্থলে দেখেও সে বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না যে কাদেরই হত্যাকারী । উপরন্তু নিজস্ব যুক্তি বিশ্লেষণে কাদেরকে সে নির্দোষ ভাবতে শুরু করে । কিন্তু কাদেরের সততা কিংবা দরবেশীর কোনো বলিষ্ঠ যুক্তি নিজের ভেতর দৃঢ় করতে না পেরে ক্রমান্বয়ে স্বপ্ন কল্পনার গভীরে আশ্রয় নিতে শুরু করে সে। তাই তার মনে ঘুরতে থাকে নানা প্রশ্ন--

১. ‘বাঁশঝাড়ে পড়ে থাকা যুবতী নারীকে কে হত্যা করেছিল ?’

২. ‘কাদের কি যুবক শিক্ষককে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেছিল ?

৩. ‘সে-রাতে কাদের তার ঘরে কেন এসেছিলো ? যুবক শিক্ষকই হত্যাকারী কিনা সে-কথা নিশ্চয় করে দেখার উদ্দেশ্যে কি ? বা গভীর রাতে একটি অসহায় মৃতদেহ দেখে মনে পরম নিঃসঙ্গতা বোধ করলে সঙ্গলিপ্সা স্বান্তনা-আশ্বাসের জন্যে ?’

৪. 'যুবতি নারীর মৃতদেহটি গুম করে দেবার অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্তের কারণ কী ?'

৫. 'সাহায্যের জন্যে কাদের তারই কাছে কেন আসে ? প্রথম রাতে সে কি তার দুর্বল নির্বোধ চরিত্রের যথেষ্ট প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে নাই ? তারপর মানুষের উপর নির্ভর করার কথা কী করে সে ভাবতে পারে?'

আরেফ আলী আবিষ্কার করে তার চারপাশে ঘোর অন্ধকার, যে-অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মতোই সে প্রশ্নগুলো তৈরি করেছে । সে বুঝতে পারে একমাত্র কাদেরই পারবে তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে । একারণে সে চেষ্টা করে কাদেরের সাথে যোগাযোগ করার । অবশেষে কাদের একদিন তার সকল মীমাংসার অবসান ঘটায় । তবে তা না ঘটলেই বোধ হয় ভলো হত । কারণ কাদের জানায়, সে-ই বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীকে হত্যা করেছিল, এমনকি ঐ নারীর প্রতি তার মনে কোন 'মায়ামমতা'-ও ছিল না । যুবক শিক্ষকের জগত ভেঙ্গে পড়ে । সে ভেবেছিল কাদেরের মনে যদি ঐ যুবতীর প্রতি বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা থেকে থাকে তবে সে কাদেরকে ক্ষমা করে দেবে । কিন্তু কাদেরের কথায় সে বুঝতে পারে - 'কাদেরের পক্ষে দরিদ্র মাঝির বউ এর প্রতি কোনো ভাবাবেগ বোধ করা সম্ভব নয় ।' আর তার পক্ষেও সমস্ত কিছু জানার পরে কাদেরকে ক্ষমা করা সম্ভব নয় । আরেফ আলীর এই আবিষ্কার তার চৈতন্যের স্তরে স্তরে সৃষ্টি করে এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের । সে সংশয়ে আন্দোলিত হয়েছে, জিজ্ঞাসায় অস্থির হয়েছে, জীবন-পিপাসায় ব্যাকুল হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সত্যকে জেনেছে । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অত্যন্ত নিপুণ-শিল্প দক্ষতায় আরেফ আলীর জীবনের এই জটিল জিজ্ঞাসার প্যাঁচ খুলেছেন । আরেফ আলীর সত্যকে এবং নিজেকে আবিষ্কারের এই কাহিনি চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতির মৌন-স্বগতোক্তি (*interior monologue*), স্মৃতি-রোমন্থন, মন্তাজ্ এবং ফ্ল্যাশ-ব্যাকের প্রয়োগকৌশল- আশ্রয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । আর এজন্য তিনি নতুন এক ভাষারীতিও ব্যবহার করেছেন এ উপন্যাসে । এ সম্পর্কে তিনি বলেই নিচ্ছেন--

''এ বইয়ের ভাষা আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই ফলটারিং করেছি । দ্বিধাগ্রস্থ যুবক শিক্ষকের বিলম্বিত চৈতন্যকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কিছুটা হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গি তৈরি করতে হয়েছে । আমি অবশ্য আরও জটিল করতে পারতাম, ফকনারের 'দি সাউন্ড অব ফিউরী'-র মতো, কিন্তু ইংরেজি ভাষা, বিশেষ করে গদ্য ভাষা যে সমস্ত শিল্পগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাংলা তো তা নয়, বাংলা লিখিত গদ্যের চলাচলও দীর্ঘ নয় ।তাই একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাকে

কাজ করতে হয়েছে । একবার ভেবেছিলাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যভঙ্গির সঙ্গে আধুনিক গদ্যভঙ্গির মিশ্রণ ঘটিয়ে চরিত্রের দ্বিধা-দন্দ্বকে স্পষ্ট করবো । কিন্তু গল্পের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হবার ভয়ে সেদিকে অগ্রসর হইনি ।''[৫]

উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি আরেফ আলীর যে বিভ্রান্তি, মানস চাঞ্চল্য, অস্থিরতা তার কারণ বর্ণনায় মূল ঘটনার বর্ণনাকে ওয়ালীউল্লাহ্ পশ্চাদানুসারী করে রেখেছেন। যেমন 'কীভাবে রাত্রির অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি শুরু হয় ?' এর বিস্তৃত বিবরণ শেষে তিনি আবার ফিরে এসেছেন যুবতী নারীর মৃতদেহ দর্শনে, শুরুর বর্ণনার রেশ অনুযায়ী আরেফ আলী সেই দিশেহারা অবস্থায় অবিশ্রান্তভাবে মাঠে-ঘাটে ছোটাছুটি করার বর্ণনায়--

''কিন্তু কখন সে মৃতদেহটি প্রথম দেখে ? এক-ঘন্টা, দু-ঘন্টা আগে ? হয়তো ইতিমধ্যে এক প্রহর কেটে গেছে, কিন্তু যুবক শিক্ষক সে কথা বলতে পারবে না ।..... তখন থেকে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটাছুটি করছে । হয়তো এক প্রহর হল ছুটাছুটি করছে । চরকির মতো, লেজে কেরোসিনের টিন বেঁধে দিলে কুকুর যেমন ঘোরে তেমনি । কেন তা সে বলতে পারবে না । কেবল একটা দুর্বোধ্য তাড়না বোধ করে বলে দিশেহারা হয়ে অবিশ্রান্তভাবে মাঠে-ঘাটে ছুটাছুটি করে, অফুরন্ত জ্যোৎস্নালোকে কোথাও গা-ঢাকা দেবার স্থান পায় না, আবার ছায়াচ্ছন্ন স্থানে নিরাপদও বোধ করে না । গভীর রাতে এমন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পশ্চাদ্ধাবিত অসহায় পশুর মতো সে জীবনে কখনো ছুটাছুটি করে নাই। অবশ্য গ্রামবাসী অনভিজ্ঞ যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহও কখনো দেখে নাই ।''[৬]

'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের আরেফ আলী নিঃসঙ্গ বলেই চেতনাপ্রবাহের অর্ন্তমুখী সংলাপের পদ্ধতিই তার আত্মপ্রকাশ ও আত্মসমীক্ষার সঙ্গততম পদ্ধতি । নির্জন, নিঃসঙ্গ জলধারার মত সে একা একা কথা কয় --

''শীঘ্র যুবক শিক্ষক নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করে । একটা নিদারুণ বেদনায় বার-বার ভেতরটা মুচরে ওঠে ।অকারণেই যেন কতগুলি অর্থহীন ঘরোয়া চিত্র তার মনের পর্দার ওপর দিয়ে ভেসে যায় । তার গ্রামের মুদির দোকানের ফেনি বাতাসা, ঘরের পেছনে শেওলাপড়া ছায়াচ্ছন্ন পুকুর, পড়শীর নূতন বেড়া । তার বর্তমান যাত্রার পরিণাম তার কাছে প্রত্যক্ষগোচর হয় না বলে হয়তো তার ভীত মন পশ্চাতের পরিচিত স্থানে খুঁটি গাড়তে চায় । অথবা যা সে পেছনে ফেলে যাচ্ছে তার মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে । হয়তো এখনো ফিরবার সময়

আছে । যা সে ফেলে যাচ্ছে তার মূল্য জানে না কিন্তু সেখানেই তার প্রত্যাবর্তন করা উচিত। জীবনের মূল্য কি কেউ কখনো সঠিকভাবে বুঝতে পারে ? মানুষ সর্বদা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, জীবনের মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে কিন্তু সক্ষম হয় কি? কী দিয়ে ওজন করে তুলনা করে ? স্বর্ণকারের নিক্তিতেও তার মূল্য যাচাই করা যায় না । তার মূল্য নিরূপণের কোন মানদন্ড নাই ।''[৭]

এরকম কল্পনা, স্বপ্নাচ্ছন্নতা চেতনাপ্রবাহরীতির অপরাপর বৈশিষ্ট্য হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীকে কোনো একক স্বপ্ন-কল্পনার ভেতর আবদ্ধ রাখেননি । স্বপ্নের কথা এই উপন্যাসে এসেছে ঠিকই কিন্তু তা সচেতনভাবেই যুবক শিক্ষকের নিজস্ব যুক্তি-চিন্তার প্রতিরূপ হিসেবে । এক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণবাদের প্রতিরক্ষা কৌশল -এর প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

এভাবে সমগ্র উপন্যাসেই কখনো স্বগত ভাবনায়, আবার কখনো বা স্বপ্নালুতার মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে চেতনাপ্রবাহরীতির অনুসরণে আরেফ আলীর আত্মপরিক্রমন তুলে ধরেছেন লেখক । এছাড়াও তার চেতনার অনুচ্চারিত বিবৃতি প্রদানে সময়ের ধারাক্রম নিপুণ শৈল্পিক নিষ্ঠায় খন্ড-বিখন্ড করেছেন তিনি ।

বলা হয়ে থাকে 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) ওয়ালীউল্লাহের শ্রেষ্ঠ চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস। কিন্তু এর সত্যতা নিরূপনের পূর্বে আমরা পুনরায় একবার দেখে নেব চেতনাপ্রবাহরীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক কী কী --

১. এই রীতিতে রচিত উপন্যাস বা ছোটগল্পে সুনির্দিষ্ট কোন প্লট থাকে না ।

২. আনুপার্বিক কোন কাহিনিসূত্রের পরিবর্তে এখানে গুরুত্ব দেয়া হয় চরিত্রের অন্তঃসংলাপ, চেতনাপ্রবাহ, চিন্তার খাপছাড়া অনুষঙ্গ, মনের স্বেচ্ছাবিহার, অস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি, অবচেতন মনের বিচিত্র জটিলতাকে ।

৩. বাইরের বস্তুরূপকে নয়, বরং এক্ষেত্রে লেখকের লক্ষ্য থাকে Inner Ceality বা 'অন্তর্বাস্তবকে পরিস্ফুট করা ।

৪. বাহ্যিক সক্রিয়তার (Doing) চাইতে চরিত্রদের অন্তর্দহন (Suffering), বিষাদ, ক্ষোভ, অচরিতার্থতাবোধের যন্ত্রণা, গোপন অপরাধবোধ অধিক গুরুত্ব পায় ।

৫. কৃতকর্ম এবং অপরাধবোধের অকপট স্বীকারোক্তি (Confession), গভীর আত্মানুসন্ধান (Self-detection), আত্মসমীক্ষা (Self-investigation), আত্মবিশ্লেষণ (Self-analysis), বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসীম নৈসঙ্গের শিকার হওয়া এই উপন্যাসের চরিত্রসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

৬. মূল প্রসঙ্গ থেকে সহসা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া, বারম্বার ভাবনা-সূত্র ছিঁড়ে যাওয়া, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পর্যালোচনা, হঠাৎ তুচ্ছ বিষয়ের অবতাড়না, যে কোন বিষয়ের বস্তুরূপ থেকে অনুপুঙ্খতার দিকে সরে যাওয়া এই রীতির প্রধান কুললক্ষণ ।

৭. এই জাতীয় উপন্যাসের চরিত্ররা একটা আত্মক্ষয়ী উদ্বেগের শিকার । লবণাক্ত সমুদ্রের মাঝখানে এরা যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ । নিজেকে চেনার এবং অপরের কাছে নিজেকে চেনাবার এক শোচনীয় প্রয়াস এদের প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করে ।

৮. বর্ণিতব্য বিষয় এবং স্বগত ভাবনার মধ্যে কার্যকারণ-সূত্র প্রায়শই উপেক্ষিত হয় অন্তশ্চৈতন্যের প্রেরণায় । একাকার হয়ে যায় স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ । চরিত্রদের মনে বুদ্বুদের মতো ভেসে ওঠে হারিয়ে যাওয়া অতীতের অসংখ্য টুকরো টুকরো ঘটনা । সেই খন্ড-বিখন্ড, সংলগ্ন-অসংলগ্ন চিন্তন প্রবাহের উপরে চরিত্রের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না । বরং অশরীরী প্রেতের মতো রাশি রাশি স্মৃতিগুচ্ছ এক্ষেত্রে চরিত্রগুলোকে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করে । সেইসব স্মৃতির টুকরো সাজিয়ে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটা কল্পিত সরণী নির্মাণ করে মরমী পাঠক গড়ে তুলতে পারেন একটা অনুভূতিময় প্লট ।

১০. প্রচলিত ধারার গতানুগতিক ছক ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসা এই জাতীয় সৃষ্টিকর্মে তথাকথিত নায়ক-নায়িকার ভাবমূর্তি নির্মাণকে, তুঙ্গ-পরিস্থিতি (Climax) সৃজনকে, চরিত্রের ক্রমবিকাশকে কিংবা মর্মভেদী সংলাপ রচনা অগ্রাহ্য করে চরিত্রগুলির মনন, চিন্তন, উদ্ভট খামখেয়ালী আচার-আচরণ এবং অনুচ্চারিত এষণাকে প্রশ্রয় দেয়া হয় ।

এখন দেখা যাক চেতনাপ্রবাহরীতির এই সকল বৈশিষ্ট্যের ঠিক কতটা ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসে রয়েছে । ‘কাঁদো নদী কাঁদো’- উপন্যাসে সুনির্দিষ্টভাবে কোন আনুপূর্বিক সূত্র-সমন্বিত ‘প্লট’ নেই । কথক ‘আমি’ এবং তবারক ভুঁইয়ার জবানীতে মুহম্মদ মুস্তফার অখন্ড চিন্তার স্রোত কোনো নিটোল কাহিনি গড়ে তুলতে দেয় নি । কেবল জীবনের কিছু মুহূর্তকে ব্যাপক ও গভীরভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে । সমগ্র উপন্যাসটিকে ব্যাপ্ত করে আছে চরিত্রের মনের কথা । এখানে কোন প্লট নয়, প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের সূক্ষাতিসূক্ষ অনুভূতি আর অনুচ্চারিত মানস-কথন । যেমন-‘মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যই খোদেজা

আত্মহত্যা করেছে'-এ কথাটি শোনার পর মুহাম্মদ মুস্তফার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা মুহম্মদ মুস্তফার জবানীতেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক--

''এ-সব সত্য নয়, সে- বিষয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে কোন সন্দেহ থাকে না । তার প্রতি খোদেজার হৃদয়ে যদি তেমন স্নেহ মমতার শতাংশও থাকত তবে সে কি জানতে পেত না ? মেয়েমানুষ মনের কথা লুকাতে পারে সত্য, তবে এমন গভীর স্নেহমমতা যা প্রত্যাখাত হলে মানুষ আত্মহত্যার মত ভীষণ কান্ডকরে বসে, তা সম্পূর্ণভাবে লুকানো সম্ভব নয় । সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই খোদেজার আচরণ ভাবভঙ্গি স্মরণ করে দেখে কিন্তু বাড়ির মেয়েমানুষদের কাহিনির সমর্থনে কিছুই খুঁজে পায় না । প্রতিবার দেশের বাড়িতে ফিরে এলে সকলের মত খোদেজাও তার সেবাযত্ন করত, সে-ব্যাপারে তার হিস্যা কম ছিল না বেশিও ছিল না । কোনো-কোনো বিষয়ে সে যদি একাই খাতির-যত্নের অধিকার রাখত তার কারণ এই যে, বয়সের জন্য কারো হাতে কোনো কাজ শোভা পায় কারো হাতে কোনো কাজ শোভা পায় না। সে-জন্যেই হাত-মুখ ধোয়ার সময়ে উঠানে বদনা ধরত বা খাওয়ার সময়ে কোনোদিন হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করত । তবে সে যখন বদনা থেকে পানি ঢালত বা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করত তখন কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও মুহাম্মদ মুস্তফার এ-কথা মনে হয় নি যে সে বেশ একটু আদর করেই পানিটা ঢালছে বা বিশেষ মমতার সঙ্গে হাতপাখাটা নাড়ছে । কোথায় ছিল তার সেই গভীর স্নেহমমতা ভলোবাসার প্রমাণ ?''[৮]

একই ঘটনার প্রেক্ষিতে উপন্যাসের কথক আমির যে অন্তর্গত সত্তা, তার নিভৃত নির্জন অবচেতন মনের যে গোপন ছবি তাও অজানা থাকে না পাঠকের কাছে-

''প্রতিশ্রুতিটির কথা অসত্য নয় । বিধবা হয়ে ছয়-সাত বছরের খোদেজাকে নিয়ে ছোট ফুফু যখন উত্তর-ঘরে আশ্রয় নেয় তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বাপ খেদমতুল্লা বোনের দুঃখে দুঃখপরবশ হয়ে স্থির করে মুহাম্মদ মুস্তফা বড় হয়ে খোদেজাকে বিয়ে করবে । তখন ওয়াদা করার বয়স হয় নি মুহাম্মদ মুস্তফার, হলেও তার মতামতের জন্য কেউ অপেক্ষা করত কিনা সন্দেহ । তবে নিঃসন্দেহে সে-সময়ে গুরুতরভাবেই প্রতিশ্রুতিটি গ্রহণ করেছিল, হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফাও তারই অজান্তে সেটি তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটি চুক্তি বলে স্বীকার করে নিয়েছিল । সে-জন্যেই কি বড় হয়ে প্রতিবার দেশের বাড়িতে আসবার সময়ে খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি উপহার নিয়ে আসত না-একটি রঙিন ফিতা, ছোট একটি আয়না, চিরুনি, সুগন্ধ তেলের শিশি ? তবে এ-কথাও সত্য যে খোদেজার জন্যে সে-সব উপহার আনা বন্ধ না

করলেও ক্রমশ একটি নীরবতার মধ্যে সে প্রতিশ্রুতি একদিন সারশূন্য উক্তিতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে; যা এক সময়ে গভীরভাবে ভারি হয়ে মানুষের মনে বিরাজ করেছে, যা অলঙ্ঘনীয়ও মনে হয়েছে-তা সহসা একদিন বাস্তবের উগ্র আলোয় এবং অবস্থান্তরিত সত্যের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিচে বুদ্‌বুদের মতো উড়ে গিয়ে পশ্চাতে কোনো দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ রেশও না রেখে । বস্তুত বহুদিন কথাটি কেউ তোলে নি; যে-মানুষ ইতিমধ্যে কী-একটা রহস্যময় উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বাড়ির ক্ষুদ্র গন্ডি অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার্থে দূরে চলে গিয়েছে, সে-মানুষের দিকে তাকিয়ে কথাটি তুলতে কারো হয়তো সাহস হয় নি । কিছুদিন আগেও বড়চাচী খোদেজার বিয়ের কথা তুলেছিল । ঈদের উপলক্ষে পাওয়া চাঁপাফুলের মতো হলদে শাড়ি পরে খোদেজা উঠোন অতিক্রম করে দক্ষিণ-ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সে-সময়ে তার বড় চাচী সহসা তার বিয়ের কথা পারে । তবে সে-দিনও সে প্রতিশ্রুতিটার কোনো উল্লেখ করে নি । সত্যি, এতদিনের প্রতিশ্রুতিটার কিছু আর থাকে নি । সেটি সমস্ত অর্থ হারিয়ে না ফেললে মুহাম্মদ মুস্তফা যখন বন্ধু তসলিমের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে তখন ক্ষণকালের জন্যেও কি দেশের বাড়ির দিকে তার মন ফিরে যেত না, কোনো দায়িত্ববোধের স্মৃতি হঠাৎ জেগে উঠে তাকে ঈষৎ বিচলিত করত না ?''[৯]

'কাঁদো নদী কাঁদো'-উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র সাকিনা । কুমুরডাঙ্গার রুগ্ন, দরিদ্র, সংসারের সমুদয় দায়ভারে ক্লান্ত অকাল যৌবন অতিক্রান্ত মাইনর স্কুলের সাধারণ শিক্ষিকা এই চরিত্রটির কানে প্রথম বাকাল নদীর রহস্যময় কান্না পরিশ্রুত হয় । যার ফলে সাকিনাকে ঘিরে সজাগ হয়ে ওঠে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ । লেখকের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় সাকিনা জীবন্তভাবে ধরা দিয়েছে নিজস্ব সত্তা আর একাকীত্ব নিয়ে--

''.....একদিন দেখতে পায় নানাবিধ রোগব্যাধিতে তার মা বার বার শয্যাশায়িনী হতে শুরু করেছে বলে সংসারের কাজ-কর্মে গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে পরেছে সে : ঘাটে খেয়ানৌকা এসে ভিড়লে যাত্রী যেমন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠে আপন পথে চলতে শুরু করে তেমনি সহসা এবং সহজেই সে সাংসারিক জীবনে লিপ্ত হয়ে পড়ে । কেবল একটি কাঠের পুতুল বেশ কিছুদিন সঙ্গ ছাড়তে চায় নি । .....তার কাজ কি কখনো শেষ হয় ? সারা দিন স্কুলে পড়ানো, মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করা, ঘরদোর সাফ করা, সন্ধ্যার আগে বাপের জন্যে ভেতরের বারান্দার প্রান্তে বদনা ভরে অজুর পানি রাখা, সকলের অলক্ষ্যে ঘরের কোণে আবছা অন্ধকারে নামাজটাও পরে নেওয়া, পরে উঠানের শেষে তিনদিক-খোলা গোয়ালঘরে মধুবিবি নামক

গাইটিকে দানা-পানি দেওয়া, সময় করে ছোট ভাইবোনদের পড়াটা দেখিয়ে দেওয়া, সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা, আরো পরে বাসন-পাতিল ঘষে-মেজে সাফ করা-অনেক তার কাজ যা সে নিত্য নিঃশব্দে একটির পর একটি করে যায় । অনেক রাত করে সে যখন শুতে যায় তখন বিছানায় আশ্রয় নেবা মাত্র ঘুমটা ঝট্ করে এসে যায় । প্রথমে সহসা সমস্ত দেহে যে-গভীর অবসাদ বোধ করে সে-অবসাদের সঙ্গে মিশে ভেতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে ওঠে, দৈনন্দিন সাংসারিক কথা বা স্কুলের চুটিচাটি কথা হাল্কা মেঘের মতো তার মনের সীমানায় কয়েক মুহূর্ত উড়ে বেড়ায় কোথাও ছায়া না ফেলে, তারপর সে-সব কথা কখন স্বপ্নের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়,আবার স্বপ্ন গভীর নিদ্রায় অন্তর্হিত হলে নিদ্রার নিরাকার বিস্মৃতির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । কেবল ক্বচিৎ কখনো ঘুম আসতে ঈষৎ দেরি হলে অদৃশ্য নিশাচর পাখির মতো রাতের অন্ধকার থেকে উড়ে এসে অন্যান্য কথা মনে নিঃশব্দে ডানা ঝাপটায় :জীবন-মৃত্যুর কথা, বেহেস্ত-দোজখের কথা, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের রহস্যের কথা, সে-সব সে ভাবেই কেবল, কোনো উত্তর সন্ধান করে না : উন্মুক্ত মাঠের শেষে দিগন্তের দিকে গ্রাম্যবধূ যেমন অস্ফুট কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে তেমনি তার মনও আস্তে-আস্তে চোখ মেলে সে-সব রহস্যময় কথাগুলির বিষয়ে ভাবে মনে একটু ভয় বা বিহ্বলতা বোধ না করে, যেন যে-দুর্বোধ্য দিগন্তের দিকে তাকায় সেখানে যদি ভয়ের বা বিহ্বলতার কিছু থেকে থাকে তা তাকে স্পর্শ করবে না : সে-সব বিষয়ে কোনো কারণে জরায়ুস্থিত জীবের মতোই সে নিরাপদ বোধ করে । সে কখনো কোনো অভাব বোধ করে না, কিছু কামনাও করে না ।''[১০]

'ফেনোমেনোলজি'-র এক অসামান্য দৃষ্টান্ত 'কাঁদো নদী কাঁদো' । উপন্যাসে শুধু মুহাম্মদ মুস্তফা, তবারক ভুঁইয়া বা সাকিনাই নয় তবারক ভূঁইয়া উচ্চারিত কুমুরডাঙ্গার জনজীবন এবং সেই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বিবিধ পেশার বিবিধ আচার-আচরণে সমৃদ্ধ মানুষ-উকিল কফিলউদ্দিন, মোক্তার মোসলেহউদ্দিন, দোকানদার, স্টেশন মাস্টার, খতিব মিঞা, আমিনা, খোদেজা, আয়েষা, ডাক্তার বোরহানউদ্দিন সকল চরিত্রই অন্তর্লোকের গহন আলো-অন্ধকারময় জগতে ছন্নছাড়া নিঃসঙ্গ পথিকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে । নীরব মাকড়সার মতো তারা বয়ন করে চলেছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনা-প্রবাহের তত্ত্ব । কখনো তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে, কখনো অন্যের মতামতকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কষ্টিপাথরে যাচাই করার চেষ্টা করেছে ।

চেতনাপ্রবাহরীতির মূল যে বৈশিষ্ট্য, কাহিনিকে সরলরৈখিক বিস্তার থেকে মুক্তিদান অর্থাৎ সময়ের ক্রমানুগতাকে ভেঙ্গে ফেলা, বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করা, 'কাঁদো নদী কাঁদো'-র আখ্যান বর্ণনায় এই রীতি ও বৈশিষ্ট্যেরই অনুসরণ করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । এ উপন্যাসে ঘটমান বর্তমান, অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ সময়ের নিরুদ্দিষ্টতায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কখনো কখনো । মুহাম্মদ মুস্তফার জটিল অভ্যন্তর থেকে তাই কখনো তন্দ্রায়, স্বপ্নে কিংবা আচ্ছন্নতার ঘোরে বিবৃত হয়েছে চরিত্রটির অনুচ্চারিত আত্মসংঘর্ষণ । খোদেজার আত্মহত্যা থেকে সৃষ্ট তীব্র অপরাধবোধ মুহাম্মদ মুস্তফার চেতনার নিশ্ছিদ্র জগতে জাগরুক করে তোলে অতীত স্মৃতিতাড়িত অস্পষ্ট এক বিভ্রম । তার অসুস্থ বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত সেই অন্তঃক্ষরণ সুচারু দক্ষতায় ফুটে উঠেছে উপর্যুক্ত বর্ণনায় --

''কখন মুহাম্মদ মুস্তফা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকবে, কারণ তার মনে হয় সে যেন কুমুরডাঙ্গা নামক একটি মফস্বল শহরের অন্যতম সরকারি বাড়ির বারান্দায় বসে নেই,বসে রয়েছে একটি নৌকার ওপর । নৌকা ঈষৎ দুলছে, থেকে-থেকে পানি থেকে ছলছল শব্দও আসছে । খালের পথ । তবে সে চাঁদবরণঘাটে স্টিমার ছেড়ে ছাপরশূন্য নৌকায় উঠেছে । দুপাশে সুপরিচিত মাঠ-ক্ষেত, দূরে গাছপালায় ঘেরা ছায়াশীতল গ্রাম । তারপর অনেক সময় কাটে; পথটি যেন বেশ দীর্ঘ । শীঘ্র কোনো কারণে সে বিস্মিত হয় । সে ভাবে : চাঁদবরণঘাটে স্টিমার থেকে নেবে খালের এ-পথ দিয়ে চিরদিনই কি তাকে যেতে হবে ? তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষ বিস্ময়কর কথাও বেশিক্ষণ ভাবে না, ভাবছে মনে হলেও তার ভাবনা অগাধ পানির ওপর, সমীরণ-আলোড়িত ঈষৎ তরঙ্গমালার মতো হাল্কাভাবে খেলা করে, নিচে তন্দ্রা অগাধ পানির মতোই স্থির হয়ে থাকে । কিন্তু খাল কোথায় ? এ যে পুকুর, শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো ছোট পুকুর পাড়ের দিকে বা পাড়স্থিত গাছপালার দিকে তার দৃষ্টি নেই । দৃষ্টি একটি মুখের ওপর যে-মুখ সে-পুকুরের পানি থেকে ভেসে উঠে এসেছে । সম্পূর্ণভাবে নয়, কারণ ওপরে এসেও আবার কিছু ডুবে রয়েছে যে-জন্যে তা অপরিচিত মনে হয় । তবু সে-মুখটি অপরিচিত মনে হবে কেন ? সে কি খোদেজার মুখ ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছে ? শুধু তার মুখ নয়, ভাবভঙ্গিও অপরিচিত ঠেকে; এমন ভাবভঙ্গি খোদেজার মুখে কখনো লক্ষ্য করে নি । ঠোঁটের পাশে কেমন বিদ্রুপাত্মক হাসি বা তিরস্কারের আভাস-যা খোদেজার মুখে কখনো দেখে নি । না, বিদ্রুপাত্মক হাসি বা তিরস্কারের ভাব নয়, তার মুখে গভীর দরদের ছায়া, এবং যে-

বড়-বড় চোখ খোদেজার চোখের মত ঠিক নয় সে-চোখে উৎকণ্ঠা । তবে কি কিছুই হয় নি ? সে কোনো অন্যায় করে নি, খোদেজারও মৃত্যু হয় নি ? সবই কি দুঃস্বপ্ন মাত্র ?''[১১]

প্রায় সমগ্র উপন্যাসেই তৃতীয় পুরুষে বিবৃত হওয়া এই বর্ণনারীতিতে আত্মকথন ও ন্যারেটিভিটির যে সংশ্লেষণ তা চেতনাপ্রবাহেরই এক ধারার প্রকাশ । বস্তুত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনাপ্রবাহরীতির সার্বিক নিরীক্ষণ কুশলতার বিচারে 'কাঁদো নদী কাঁদো'-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' বাদ দিলে 'কাঁদো নদী কাঁদো' -তেই তাঁর চেতনাপ্রবাহরীতির সার্থকতম এবং পূর্ণতর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এমন একটি ধারণা অমূলক নয় ।

শুধু উপন্যাসই নয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অধিকাংশ ছোটগল্পও আংশিকভাবে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত । তাঁর প্রথম রচনা ' সীমাহীন এক নিমেষে ' থেকেই চরিত্রের মনোলোক এবং মনোগহীনের অনবিচ্ছিন্ন আলো আঁধারির এই সূচনা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের 'নয়নচারা', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'খুনী', 'রক্ত', 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প'-গ্রন্থের 'দুইতীর', 'পাগড়ি', 'নিষ্ফল জীবন 'নিষ্ফল যাত্রা', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'স্তন', 'মতিউদ্দিনের প্রেম', অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছের 'মানুষ', 'স্থাবর', 'না কান্দে বুবু' প্রভৃতি গল্পগুলোতে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । তবে সবগুলো গল্পেই উঠে এসেছে নিজস্ব সমাজ, পরিমন্ডল এবং বাস্তব সমস্যায় নিয়ত জর্জরিত কিছু সাধারণ মানুষ, তাদের বেঁচে থাকা, আনন্দ আকাঙ্খা এবং স্বপ্নীল চেতনায় ভাসমান জীবন কাহিনি । অর্থাৎ রীতির দিকে নজর দিতে গিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর লেখার মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে আসেননি।

এদের মধ্যে 'নয়নচারা'-র প্রায় সবগুলো গল্পেই স্বসমাজ, পরিবেশ এবং নূন্যতম দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে না পারা কিছু সাধারণ মানুষ, তাদের নানা সমস্যা আবার সেই সমস্যা নিয়েও বেঁচে থাকার চেষ্টা, তাদের হাসি-আনন্দ এবং স্বপ্নীল চেতনায় ভাসমান সেই জীবন কাহিনির কথা বলা হয়েছে । প্রথম গল্প 'নয়নচারা'তেও এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বর্তমান । গল্পটিকে আমরা শুরুই হতে দেখি আমুর আত্মমুখী স্মৃতিচারণা দিয়ে--

''ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে । কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী: রাতের নিস্তব্ধতায় তার স্রোত কল-কল-করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙ্গিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে ।

তবে, ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে : ময়ূরাক্ষী ! কোথায় ময়ূরাক্ষী ! এখানে-তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া । যে-হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে-হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে ?''[১২]

আবার গল্পটির শেষও হয়েছে আমুর স্বপ্নীল ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে--

''কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্তগলায় শুধু বললে : নাও

কী ? কী সে নেবে ? ভাত নেবে । ভাতই কি সে নিতে চায় ? সে ভাতই চায় : এ-দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না । ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল মেয়েটির পানে । মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা । না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন ।

-নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি ?

মেয়েটি কোন উত্তর দিলে না । শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে ।''[১৩]

বাস্তবতার সর্বাঙ্গীন এবং সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং বিধ্বস্ত মানবিক অবক্ষয়-কোনো কিছুকেই বিস্তারিতভাবে এ গল্পে উপস্থিত করেন নি লেখক, যা হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক ছিল । ওয়ালীউল্লাহ্ এ গল্পে শুধুমাত্র ব্যক্তি আমুর অচেতন, আত্মানুভূতির এক স্বপ্নময়-শৈল্পিক বিকাশ করেছেন । প্রায় একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায় 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পে । তবে এখানে একক নয় ব্যাপক মানুষের চৈতন্যের প্রসার ঘটেছে অনাহার ও মৃত্যুর ছায়া দেখা মানুষের জীবন শঙ্কায় ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'খুনী'-গল্পটির সংগঠনও চেতনাপ্রবাহরীতির। গল্পটি চর আলেকজান্দ্রার সোনাভাঙ্গা গ্রামের রাজ্জাকের মানস ভুবন, তার খুনী হৃদয়ের অনিবার্য টানাপোড়েন তার মনে জন্ম দিয়েছে অনুশোচনা, নিঃসঙ্গতার এবং আত্মপীড়নের -

'' .....শূন্য অন্তর কেঁদে উঠল ,কেঁদে উঠল কার জন্যে ? কেঁদে উঠল তার-ই জন্যে, যার কথা এক মুহূর্তের জন্যেও মনের কোনে স্থান দেয় না, ... অপরাধী সে, কিন্তু অপরাধীর কি অন্তর থাকে না ? খোদা তাকে কখনো মাপ করবেন না-এ-কথা সে জেনেছে, তবু ওর জন্যে তার হৃদয় ব্যথায় গুমরে-গুমরে উঠবে কেন ?.....

শেষে একটি কথা ভেবে শান্তিতে তার কান্না শান্ত হল । যে-লোক খুন হয়, সে বেহেশতে যায়। ফইন্যা বেহেশতে যাবে ।''[১৪]

ফইন্যার জন্য রাজ্জাকের এই যে নিঃসঙ্গ আত্ম-ক্রন্দন তা আত্মউপলব্ধিরই নামান্তর ।

'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প'-গ্রন্থের প্রথম গল্প 'দুইতীর'-এ রয়েছে আফসারউদ্দিন এবং তার শ্বশুর আরশাদ আলীর তীব্র দাম্পত্য সংকট, একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ । গল্পে তার মনোক্ষরণ, আত্মোপলব্ধি গল্পটিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে । এ গল্পের অধিকাংশ ঘটনা প্রবাহিত হয়েছে স্ত্রী হাসিনাকে ঘিরে আফসারউদ্দিনের আত্মগত ভাবনার নিঃশব্দ মগ্ন স্রোতে -

''আরেকটি কথাও অন্যান্য খবরের মতো অস্পষ্টভাবেই আফসারউদ্দিন শুনতে পেয়েছিল। তা আরশাদ আলী মরিয়ম খানের অসুখী দাম্পত্যজীবনের কথা ; তাঁদের দাম্পত্য কলহের বা আজীবন মনোমালিন্যের কারণ সে জানে না । তবে কখনো-কখনো তার মনে হয়, যে-দ্বন্দ্ব তাঁদের জীবনকে বিষাক্ত করেছিল, তার ছায়া তাদের জীবনেও যেন প্রতিফলিত হয়েছে । হাসিনা কি তার মায়ের দ্বন্দ্বই বহন করে চলেছে ?

হয়তো এ-সব আফসারউদ্দিনের খেয়াল মাত্র । হয়তো হাসিনার অক্ষমতার কারণ একটি অতি সোজা উত্তরের মধ্যেই পাওয়া যাবে । এমনই তার মানসিক গঠন যে তার পক্ষে কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয় । যে-পরিবারে সে মানুষ হয়েছে সে-পরিবারে কেউ কাউকে ভালোবাসতে শেখায় না, ভালোবাসার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না । হাসিনা হয়তো দাম্পত্যজীবনকে অন্যান্য সামাজিক প্রথার মতই দেখে ; সে-জীবন যে স্নেহ-ভালোবাসা-আশা-আকাঙ্ক্ষার সূত্রে বাঁধা দুটি মানুষের যুগ্ম জীবন, তা সে জানে না ।''[১৫]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অগ্রন্থিত গল্পাবলির মধ্যে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় তাঁর 'মানুষ' গল্পটির কথা । গল্পটিতে তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে একটি অন্ধ মেয়ের একাগ্র অনুভূতি, নিঃসঙ্গতা, জীব ও জগৎ সম্পর্কে তার বিশ্বাসভঙ্গ - সব কথাই তুলে ধরেছেন । একই গ্রন্থের 'স্থাবর' গল্পেও এক যুবকের নিঃসঙ্গ অন্তঃকরণ, তার একান্ত উপলব্ধি আকাঙ্ক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত তা পরিত্যাগ সবই লেখক এক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন-

''গ্রামান্তরের ছোট ছরার এ-ধারে কে যেন তাকে ধরে ফেললে । সে থমকে দাঁড়াল । ধরল কে তাকে ? ধরল তার বিবেক, ধরল তার অন্তরকে সাপটে । তাকে যেতে দেবে না ।

সাগরের কল্লোল থেমে গেছে মাসুদের কানে । এখন সেখানে বিরাট শান্তি । এই তার গাঁ, তার গাঁয়ের লোক । কানে বাজল কী ? বাজল অবিরাম হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ, বাজল কর্মরত লোকেদের নীরবতা আর নাকে লাগল রঙের আর কাঠের গন্ধ, আলকাতরার বিচিত্র গন্ধ । এ-গন্ধ ও এ-শব্দে তার দেহ ও অন্তর মুখরিত, এর মাঝে জড়িয়ে তার অস্তিত্ব ।

মায়ের মগী চেহারা-নির্লিপ্ত চোখ তার হঠাৎ মনে পরল । দূর, কোথায় কোন্ সাগর ? ওই চোখ-তার মায়ের ওই নির্লিপ্ত শান্তচোখের মায়া তার চোখে পানি এনে দিল ।

তার সেই অর্ধ-সমাপ্ত সাম্পান ? নীল রঙের কাজ অসমাপ্ত রেখে কোথায় সে যাচ্ছিল? ভেবেছিল কী, যে, অগাধ নীল সাগরের আর নীল আকাশের তলে বাস করতে যাচ্ছে বলে ওই সামান্য নীল রঙের খেলাকে সে হেয় করে ? কী মহা ভুল । আবার তার চোখে জল এল । সেই নীল সাগর আর নীল আকাশ কি ছোঁয়া যায় - সংকীর্ণতায় ও বাস্তবতায় আনা যায় ? সে হল দেখবার বস্তু, আর এ-রং হোক না সামান্য আর খেলো তবু এ-রং সে লাগাতে পারে, এ-রং দিয়ে জিনিস সার্থক করে, নিজেকেও । এই তার ব্যবসা । স্থাবর হতেই তার জন্ম, পরকে ভাসাবার জন্যেই তার অস্তিত্ব, সাগরের ছোঁয়া লাগুক অন্যের অন্তরে । পরের মুক্তিদাতা সে, বন্ধন জড়িয়ে থাক তাকে ।''[১৬]

আধুনিক, চিন্তশীল, উপন্যাসের অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় চেতনাপ্রবাহরীতিমূলক সাহিত্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্নশৈলী এবং অভিনব গঠনকৌশলের এক নতুন সংযোজন , যার উৎপত্তি হয় মার্সেল প্রুস্ত, ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ এবং উইলিয়াম ফকনারের মত লেখকের হাত ধরে । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা সাহিত্যে এই চেতনাপ্রবাহরীতি ধারারই এক যোগ্য উত্তরসূরি । তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অনুসৃত ধারা জেমস্ জয়েস বা ডরোথি রিচার্ডসনের ধারা থেকে ভিন্ন । তাঁর 'লালসালু'-তে রয়েছে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় বাস্তববাদী উপন্যাসের ছায়া আবার উল্টোদিকে 'চাঁদের অমাবস্যা'-তে রয়েছে বাস্তববাদী উপন্যাসের সঙ্গে চেতনাপ্রবাহরীতির সংযোজন । আবার 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্ ভাষা নিরীক্ষায় আরো এগিয়ে গেছেন । পূর্বজ দু'টি উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অন্যরকম প্রকরণের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'চাঁদের অমাবস্যা'-র মনোবিশ্লেষণ এখানে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে যেন । 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের চেতনাপ্রবাহ বয়ে গেছে স্মৃতি ও অনুষঙ্গের সূত্র ধরে । 'কথক আমি' এবং তবারক ভুইঞা -এ দুজনে মিলে যেন সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি বুনে গেছে।

‘কাঁদো নদী কাঁদো ’ উপন্যাসে যেমন উঠে এসেছে ব্যক্তি মনের সমস্যা তেমনি উঠে এসেছে সামাজিক সমস্যাও। ঔপন্যাসিক চেতনাপ্রবাহ ধারার কোনো রীতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু থেকে স্বকাল , স্বদেশ এবং সমাজকে বিচ্যুত করে কিংবা বিচ্ছিন্ন করে দেখাননি । তিনি নিজ দেশ-কাল এবং সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই চেতনাপ্রবাহ রীতির মত এক জটিল, চিন্তাশ্রয়ী, নিরীক্ষা-প্রধান আধুনিক সাহিত্য পরিবৃত্তে বাংলা উপন্যাসের শিল্প চৈতন্য এবং শিল্প সম্ভাবনাকেই করে তুলেছেন ঊর্ধ্বগামী । আর এখানেই বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির ক্রমবর্ধমান ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বাতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ।

তথ্যসূত্র :

১. James William , The Principles of Psychology (New York :Henry Holt and Co., 1890), p. 224

২. Heidbreder Edna ,ob cit ., pp 167-170

৩. Internal monologue সম্পর্কিত Dujardain-এর ভাষণটি উদ্ধৃত William J. Grace, Response to Literature (New York : McGraw-Hill Book Company, 1965), p-250

৪. ভাদুড়ী, সতীনাথ - জাগরী, পৃষ্ঠা-১০-১২,প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

৫. মোকাম্মেল, তানভীর - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্য জিজ্ঞাসা, পৃ-৬০, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ

৬. ওয়ালীউল্লাহ্‌ সৈয়দ, চাঁদের অমাবস্যা, উপন্যাসসমগ্র, পৃ-৭১, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ

৭. ঐ, পৃ-৯০,

৮. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ, - ‘কাঁদো নদী কাঁদো’, উপন্যাসসমগ্র, পৃ-১৭৫, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ

৯. ঐ, পৃ-১৭৪

১০. ঐ, পৃ-১৯৮

১১. ঐ, পৃ-২৪৬

১২. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ - ‘নয়নচারা’, গল্পসমগ্র, পৃ-৩, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ

১৩. ঐ পৃ-৭,

১৪. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, ‘খুনী’, পৃ-৩৩, ঐ

১৫. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, ‘দুইতীর’, পৃ-৬০, ঐ

১৬. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, ‘স্থাবর’, পৃ-২০৬, ঐ